প্রবন্ধ

জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- জীবন স্মৃতি 4
- শিক্ষারম্ভ 7
- ঘর ও বাহির 9
- ভৃত্যরাজক তন্ত্র 20
- নর্মাল স্কুল 24
- কবিতা রচনারম্ভ 28
- নানা বিদ্যার আয়োজন 31
- বাহিরে যাত্রা 36
- কাব্যরচনাচর্চা 39
- শ্রীকণ্ঠবাবু 42
- বাংলাশিক্ষার অবসান 46
- পিতৃদেব 55
- হিমালয়যাত্রা 62
- প্রত্যাবর্তন 78
- ঘরের পড়া 85
- বাড়ির আবহাওয়া 90

- অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 96
- গীতচর্চা 97
- সাহিত্যের সঙ্গী 99
- রচনাপ্রকাশ 102
- ভানুসিংহের কবিতা 104
- স্বাদেশিকতা 107
- ভারতী 113
- আমেদাবাদ 117
- বিলাত 119
- লোকেন পালিত 133
- ভগ্নহৃদয় 135
- বিলাতি সংগীত 142
- বাল্মীকিপ্রতিভা 145
- সন্ধ্যাসংগীত 150
- গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ 154
- গঙ্গাতীর 158
- প্রিয়বাবু 162
- প্রভাতসংগীত 163
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র 173
- কারোয়ার 177

- প্রকৃতির প্রতিশোধ 180
- ছবি ও গান 183
- বালক 185
- বঙ্কিমবাবু 188
- জাহাজের খোল 192
- মৃত্যুশোক 194
- বর্ষা ও শরৎ 199
- শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 202
- কড়ি ও কোমল 204

জীবন স্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহাকিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাইরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দু'ই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে- তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে- সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে

হইয়াছে- সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে- তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে-ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীতজীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত। অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না, কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে-ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

শিক্ষারম্ভ

তখন কর, খল আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না– তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না– মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া, সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল। সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয়। উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণ-বয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত– কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে– আর মনে পড়ে, “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।’ ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ “পুলিসম্যান’ “পুলিসম্যান’ করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিসম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম, একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিসকর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো-এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা- সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম- কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা

একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি-পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম- তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই না। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের-জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহাকিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে- তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইতে, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী

সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট- দক্ষিণাধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভুমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের

রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম–

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল,এমন-কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ– মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে–

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি,আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ঠ ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ঐ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম- চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত “সিঙ্গির বাগান’ পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ

সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার গানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া “চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই’ হাঁকিয়া যাইত– তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া, ছিটকিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল– সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর-একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে

বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয় । একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া,নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোন্‌-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন- আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে-পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে-পর্যন্ত মানুষের সাজসজ্জার প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল- সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো-এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সংবৎসরের শস্য রাখা হইত- তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের

ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত, এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহির, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই, এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, “আজ সেখানে গিয়াছিলাম।’ কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে। সে বলিয়াছে, না,এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে- কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম্। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ-কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুতির হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম– তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুলঘরের কোণে যে পাহাড়সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত– মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার

ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারিধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি- দেখিয়াছি, গর্ত বড়ো হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্ধুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়- কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গেল,সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দার একটুখানি টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন- আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, “সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।” আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি; শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া

কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাস্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন, আর কেহ নয়।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই- সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তা’তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই- পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই- বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে,বড়ো যে সেই মার খায়- শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখির দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেইজন্য গুলি খাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাখি চীৎকার করিয়া দল ভাগায়, শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক, এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকারপ্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ায় অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়- সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতুহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির

হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপড়ে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া-বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে– তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চারহাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ একসময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লইত; যেন পুষ্করিণীটিকে কোনোমতে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড়চোপড়গুলাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেইগুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনো দিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে

একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, সে বরানগরকে বরাহ্নগর বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, “অমুক লোক বসে আছেন’ না বলিয়া সে বলিয়াছিল “অপেক্ষা করছেন’। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে “অপেক্ষা করছেন’ কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে– একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল– কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল– অনুপ্রাসের ঝক্মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর

বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্মপিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বলিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশকরা থাকিত। প্রথমে দুই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচিকয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত,আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো-বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

নর্মাল স্কুল

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন-কি, ভালোমানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিঙের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ংকর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনির্মিত রেলিং ভরতি হইয়াছে–আমাদের উত্তরবর্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই, করিলেও তখনকার শাসনপ্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না। – ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য,ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক্ ও অচল পদার্থ ছাড়া আর-কিছুর উপরে সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং-শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে

পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। তাহার পরে নর্মাল স্কুলে ভরতি হইলাম। তখন বয়স অত্যন্ত অল্প। একটা কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিল ইংরেজি, তাহার সুরও তথৈবচ– আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না। অথচ ইস্কুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোনো-একটা থিয়োরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁহারা ছেলেদের আনন্দবিধান করিতেছেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা সম্পূর্ণ বাহুল্য বোধ করিতেন। যেন তাঁহাদের থিয়োরি-অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ। এইজন্য যে ইংরেজি বই হইতে তাঁহারা থিয়োরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন,তাহা হইতে আস্ত ইংরেজি গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে নিঃসন্দেহ মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে–

কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি- কিন্তু “কলোকী’ কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয়- Full of glee, singing merrily, merrily, merrily।

ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর- আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে। ভাবিতাম, কুকুর বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের খুব ভালো করিয়া শায়েস্তা করিয়া, প্রথমে তাহাদের দুই-চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায়,তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে; তাহার পরে নিজেদের বাহুবল কাজে খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যখন কল্পনা করিতাম তখন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষের জয় একেবারে সুনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যখন হাতে কাজ ছিল না তখন কাজের অনেক আশ্চর্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি, যাহা কঠিন তাহা কঠিনই, যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই, ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।

কবিতা রচনারম্ভ

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরাজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, “তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।” বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য-জিনিসটিকে এ-পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্তাজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দরোয়ান যখন তাহাকে মারিতে শুরু করিল, আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্য সম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না । এখন দেখিতেছি, পদ্য-বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেকসময় দয়াও হয় কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া

কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদগম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার "ন্যাশানাল পেপার" পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কহিলেন "নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে শুনুন না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না কাব্য- গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই। কবিকীর্তি করিব জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়া উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ "দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

"দ্বিরেফ' এবং "ভ্রমর' দুটোই তিন অক্ষরের কথা । ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলাম মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফতরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না । এমন-কি তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর-কখনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরখ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে

হয় না। যাই হোক, নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু “দ্বিরেফ’ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচতি রহিয়া গেল।

নানা বিদ্যার আয়োজন

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণি-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোর অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য আঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সতীনাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই জল টগবগ করে- ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে “মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং’ হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্‌ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্‌ভাবন, এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা যে পাখির বাচ্ছাদের পরম সৌভাগ্য এ কথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে, সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয়, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালে ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে-সময়টাতে মাস্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু'চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোরবাবু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন, তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভালোমানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, পদ্য কি গদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন, মকদ্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে– ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ-পনেরো রীতিমতো লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাস্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণহাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, “আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব।” এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনালী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, এই কণ্ঠনালীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার কণ্ঠনালীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমতো বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকেল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে-দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারিসরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স্ কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই।

এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্‌সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাস্টারমহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রত্যহ ধিক্‌কার দিতেন। এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া করিয়া দুর্বোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।

বাহিরে যাত্রা

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্‌ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাঁটার আসা যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকালবেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে

তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে- এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর- ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত। এ যেন ঘরের বধু। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা আঁকা সবুজরঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুলগাছের ছায়ায়, ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল- কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ।

আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে- পায়ের শিকল কাটিল না।

একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন

করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, “যাও যাও, একনি ফিরে যাও।”- তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই- ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়তো আজ চল্লিশ বছরের কথা। তার পর সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই; কেননা, বাগান তো গাছপালা দিয়া তৈরি নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া- সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

কাব্যরচনাচর্চা

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মতো হইয়া ভিতরের লেখাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুল্‌স্‌ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।

আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি প্রাণীবৃত্তান্ত নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন।

আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করিয়া তাঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।” লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে–

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণ-স্বরূপে লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম–

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত– অত্যন্তই স্বচ্ছ।

আর-একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্‌ধৃত করি– আশা করি, ইহার ভাষা ও ভাব অলংকারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে–

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে- -
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্। কালো চাপকান পরিয়া দোতলায় আপিসঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামি ছিল পাঁচ-ছয়জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চোক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি নাকি কবিতা লেখ।” কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে

তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণগম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “পড়িয়া শোনাও।” আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে– এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই আবশ্যক– প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটোছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই-একজনমাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি, কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের অনেক পূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব, বালকের যে কীর্তিকাহিনী এখানে উদ্‌ঘাটিত করিলাম, তাহাতে বর্তমানকালের কোনো গোবিন্দবাবু বিস্মিত হইবেন না।

শ্রীকণ্ঠবাবু

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম- এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচক-পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো- অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত- তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফরাসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। বেশ মনে পড়ে, তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দিতে বাংলাতে তিনি এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন- অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন “ছবিতোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরিব মানুষ- না না, সাহেব সে কিছুতেই হইতে পারিবে না”- যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতরো অসংগত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না, তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল- তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সংকোচের কারণই ছিল না।

তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোটো দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর-কাহারো দ্বারা কখনোই সাধ্য হইত না। আর-কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে– এইজন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

আবার, তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বারবার করিয়া বলিলেন, “ও তো কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।”

কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না– ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস’ বা “শকুন্তলা’ হইতে কোনো-একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন

উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারে দুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে, নিশ্চয় তিনি ভারি খুশি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না- কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্‌ গোবিন্দবাবু হইলে সে কবিতা-দুটির আদর বুঝিতেন।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল- “ময়্‌ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।’ ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক “ময়্‌ ছোড়োঁ’, সেই-খানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে- “অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে- ভুলো না রে তাঁয়।’ এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন- “অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে’- আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন- “অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।’

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন, পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহুকষ্টে একবার মাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়।' তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই, আসন্ন মৃত্যুর সময়েও "কী মধুর তব করুণা, প্রভো' গানটি গাহিয়া তিনি চির-নীরবতা লাভ করেন।

বাংলাশিক্ষার অবসান

আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে-ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধও পড়া হইয়া গিয়াছে। পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া– বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে-সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার তো মনে হয়, নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি; কারণ, কিছু না করিয়া যে-সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে-সময়টা নষ্ট করা যায়। মেঘনাদবধ-কাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিস ছিল না। যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার-মতো হয়– তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

এই সময় আমাদের নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোন-এ একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের এক ইংরেজি জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীর ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন সকালে যখন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেবিল পাতিয়া দেয়ালে

কালো বোর্ড ঝুলাইয়া নীলকমলবাবুর কাছে পড়িতে বসিয়াছি, এমন সময় পিতার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজন ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, “আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই।” খুশিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

তখনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়; বাংলা জ্যামিতির বইখানা তখনো খোলা এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সংকল্প চলিতেছি। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ ঘরকন্নার বিচিত্র আয়োজন মানুষের কাছে যেমন মিথ্যা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিতমশায় হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ডে টাঙাইবার পেরেকটা পর্যন্ত তেমনি একমুহূর্ত মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে। কী রকম করিয়া যথোচিত গাম্ভীর্য রাখিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে আমাদের নিষ্কৃতির খবরটা দিব, সেই এক মুশকিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেয়ালে-টাঙানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেখাগুলা আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল; যে-মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর হিত হইয়া পড়িয়া রহিল যে, তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।

বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, “কর্তব্যের অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেকসময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, সে কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।”

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে– তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে– মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের

অবতারণা হয়। তার পরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারি দিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভরতি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল, আমরা অনেকখানি বড়ো হইয়াছি– অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তুত, এ বিদ্যালয়ে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেখানে কী-যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না– না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহারা হাতের তেলোয় উলটা করিয়া assলিখিয়া “হেলো’ বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত; হয়তো-বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কথা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত, ঠিকানা পাওয়া যাইত না; কখনো-বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষটির মতো অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত, দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া ভ্রম হইত। এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না– এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম– তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতিলাভ করিব,

সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারো মনে ছিল না। ছোটো ইস্কুল, আয় অল্প, ইস্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সদ্‌গুণে মুগ্ধ ছিলেন- আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বোধ করি বিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ-সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন- আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো- ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয়ে হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষ নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত- অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলায়নের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা একজনের কাছে ফরাসি পড়িতেন- তাঁহাকে সকলের মুনশি বলিত- নামটা কী ভুলিয়াছি। লোকটি প্রৌঢ়- অস্থিচর্মসার। তাঁহার কঙ্কালটাকে যেন একখানা কালো মোমজামা দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে রস নাই, চর্বি নাই। ফারসি হয়তো তিনি ভালোই জানিতেন, এবং ইংরেজিও তাঁর চলনসই-রকম জানা ছিল, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যশোলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লাঠিখেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য নৈপুন্য সংগীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে লাঠি খেলিতেন- নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দী। বলা বাহুল্য, তাঁহার ছায়া কোনোদিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না- এবং হুহুংকারে তাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যখন তিনি জয়গর্বে ঈষৎ হাস্য করিতেন তখন ম্লান হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীরবে পড়িয়া থাকিত।

তাঁহার নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মতো শুনাইত– তাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, “মুনশিজি, আপনি আমার রুটি মারিলেন।”– কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, মুনশিকে খুশি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই, তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া ইস্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচারর্বিতক করিতেন না– কারণ, তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল যে আমরা ইস্কুলে যাই বা না যাই, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

এখন, আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকে– কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল-আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে– সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেননা সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে, বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ– সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।

জাত বাঁচাইবার জন্য বাঙালি ছাত্রদের একটি স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে দুই-একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাহাদের সকলেই আমাদের চেয়ে

বয়সে অনেক বড়ো। তাহাদের মধ্যে একজন কাফি রাগিণীটা খুব ভালোবাসিত এবং তাহার চেয়ে ভালোবাসিত শ্বশুরবাড়ির কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে– সেই জন্য সে ঐ রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম ছিল না।

আর-একটি ছাত্রসম্বন্ধে কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। তাহার বিশেষত্ব এই যে ম্যাজিকের শখ তাহার অত্যন্ত বেশি। এমন-কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একখানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছেন এমন ছাত্রকে ইতিপূর্বে আর-কখনো দেখি নাই। এজন্য অন্তত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্ষরের খাড়া লাইনের মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যা চালানো যায়, ইহা আমি মনেই করিতে পারিতাম না। এ-পর্যন্ত ছাপার অক্ষর আমাদের উপর গুরুমশায়গিরি করিয়া আসিয়াছে, এইজন্য তাহার প্রতি আমার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। যে-কালি মোছে না, সেই কালিতে নিজের রচনা লেখা– এ কি কম কথা! কোথাও তার আড়াল নাই, কিছুই তার গোপন করিবার জো নাই– জগতের সম্মুখে সার বাঁধিয়া সিধা দাঁড়াইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইবে– পলায়নের রাস্তা একেবারেই বন্ধ, এতবড়ো অবিচলিত আত্মবিশ্বাসকে বিশ্বাস না করাই যে কঠিন। বেশ মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর-কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই-একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালি মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

সেই সহপাঠী গ্রন্থকার বন্ধুকে রোজ আমরা গাড়ি করিয়া ইস্কুলে লইয়া যাইতাম। এই উপলক্ষে সর্বদাই আমাদের বাড়িতে তাহার যাওয়া-আসা ঘটিতে লাগিল। নাটক-অভিনয় সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাহার সাহায্যে আমাদের কুস্তির আখড়ায় একবার আমরা গোটাকতক বাঁখারি পুঁতিয়া, তাহার উপর কাগজ মারিয়া, নানা রঙের চিত্র আঁকিয়া একটা স্টেজ খাড়া করিয়াছিলাম। বোধ করি উপরের নিষেধে সে-স্টেজে অভিনয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু বিনা স্টেজেই একদা একটা প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ভ্রান্তিবিলাস। যিনি সেই প্রহসনের রচনাকর্তা পাঠকেরা তাঁহার পরিচয় পূর্বে কিছু কিছু পাইয়াছেন। তিনি আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না, বাল্যকালে কৌতুকচ্ছলে তিনি সকলপ্রকার অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

যে-সময়ের কথা লিখিতেছিলাম ঘটনাটি তাহার পরবর্তী কালের। তখন আমার বয়স বোধ করি বারো-তেরো হইবে। আমাদের সেই বন্ধু সর্বদা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এমন সকল আশ্চর্য কথা বলিত, যাহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম– পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার এত ঔৎসুক্য জন্মিত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন দুর্লভ ছিল যে, সিন্ধুবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার, নিশ্চয়ই অসতর্কতাবশত, প্রোফেসর কোনো-একটি অসাধ্যসাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। মনসাসিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে-বীজ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে, এ কথা কে জানিত। কিন্তু যে-প্রোফেসর ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আঠা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্য রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভৃত রহস্যনিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি তো একমনে আঁটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলই রৌদ্রে শুকাইতে লাগিলাম– তাহাতে যে কিরূপ ফল ধরিয়াছিল, নিশ্চয়ই জানি, বয়স্ক পাঠকেরা সে-সম্বন্ধে কোনো

প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্‌-একটা কোণে এক ঘণ্টার মধ্যেই ডালপালা-সমেত একটা অদ্ভুত মায়াতরু যে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আমি তাহার কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার ফলও বড়ো বিচিত্র হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসংকোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে, তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্বত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাহ্নে সে প্রস্তাব করিল, “এসো, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক, কাহার কিরূপ লাফাইবার প্রণালী।” আমি ভাবিলাম, সৃষ্টির অনেক রহস্যই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো-একটা গূঢ়তত্ত্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল, আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটা অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। অনেক অনুনয়েও তাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন জাদুকর বলিল, “কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায়, একবার তাহাদের বাড়ি যাইতে হইবে।” অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেখানে গেলাম।

কৌতূহলীর দলে ঘর ভরতি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল– তাইতো, ভারি মিষ্টি গলা!

তাহার পরে যখন খাইতে গেলাম তখনো সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্বে বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অল্পই মিশিয়াছি,

সুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বেই জানাইয়াছি, আমাদের ঈশ্বর-চাকরের লোলুপদৃষ্টির সম্মুখে খাইতে খাইতে, অল্প খাওয়াই আমার চিরকালের মতো অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আমার আহারে সংকোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত, তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমাঙ্কে জাদুকরের নিকট হইতে দুই-একখানা অদ্ভুত পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকাপতন।

সত্যর কাছে শোনা গেল, একদিন আমের আঁটির মধ্যে জাদু প্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোফেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছিলেন কিন্তু ওটা আমার ছদ্মবেশ। যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৌতূহলী তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত, লাফানোর পরীক্ষায় আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম- সেই পদক্ষেপটা যে আমার কত বড়ো ভুল হইয়াছিল, তাহা সেদিন জানিতে পারি নাই।

পিতৃদেব

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে-সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি- ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা- ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একাট স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বউঠাকুরাণীর ঘরে একটা কাচাবরণে-ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রঙকরা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন-বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য সামগ্রীটি বউ-ঠাকুরানীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া, প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবিকে চকৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহাকিছু বিদেশের, যাহাকিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া য়িহুদি পোশাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা-পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধুমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন,”রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।” মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন- ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না- কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র, লিখিবার জন্য মহানন্দের দফতরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েকদিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাসুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না- চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য,

মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ-চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প-কয়েকদিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন,তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্ত-বাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল– বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ্ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম– তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে-ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে-ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো

ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই- কারণ, শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি “ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা- বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না- তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর-ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই- নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের

নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম- পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার পক্ষে সে-পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে-বেড়াইবার সময় তাঁর বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়া ছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'- এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত- ছন্দের ঝংকারের মুখে "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত- সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি "অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'- এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো-একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের-

> মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
> বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
> যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
> রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ-

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর-কিছুই বুঝি নাই- কেবল “মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর’ এবং “কম্পিতদেবদারু’ এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিতমহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে-ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশে কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়- এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়- সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহা চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে- আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া

কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

হিমালয়যাত্রা

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্, ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব, নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর-কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। “চাই’ এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, “মাথায় পরো।” পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও

যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত। উনিশ-বিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে-কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতি গত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়-যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বে পিতামাতার সঙ্গে সত্য সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের সেকালে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখাটা যে কোথায় তাহা ভালো করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রঙকরা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে

আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট– পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তার পর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়তো গাড়ি-ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা– সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরুদুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্রবৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখালবালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বাসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত। রাখালবালক হয়তো-বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না– যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদ্যগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, “কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!” আমি বলিতাম, “এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।” তিনি বলিতেন, “সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।”

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া, মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই, সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার সেদিনকার একান্তমনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে “এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে’, তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে একজায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, “ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।” তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন “তাইতো, সে তো বেশ হইবে” এবং আবিষ্কারকর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো-একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদীপাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো।

আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কার-কর্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, “তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।” তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইল সেই-দিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেইখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল– তা হিসাবের অঙ্কই

হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবি-জনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে "পৃথ্বিরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল– উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে।” পিতা কহিলেন, “না।” তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, “ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।” আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাড়িয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল– টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন– বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার

উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে, তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারি রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা-ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে-পাখির কাছে শিকারী অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারো ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের তানপুরার আওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের কাজ করিত– তাহা আমাদিগকে দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে– আমি বেহাগে গান গাহিতেছি–

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে–

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন– সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে২ সকালে ও বিকালে আম অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান– "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার৩ ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিকে হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে- কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parly's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত

করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে-বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম। দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম, আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয় কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই– কিন্তু ইহঁারা তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতে উপত্যকা-অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না– পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া, ঘনশীতল

অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো জানিতে পারে না যে এমন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবি মন মনোযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিসটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়। তাই আমি এক-একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনই বুঝিতে পারি, দেখিবার জিনিস ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না গলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোটো ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি, সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্জের হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কতরাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে “নরঃ নরৌ নরাঃ’ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন। দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু পূর্বেই জানাইয়াছি কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উল্টাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশতঃ বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বারবার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম; পিতা তাহাতে কখনো উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেক করিয়াছি– তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিমশাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম, তিনি বলিলেন, “এ তো খুব ভালো কথা; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।” এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর-একবার যখন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না। তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, “বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।” যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই।

যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর-কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন– সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই– তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালে বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌলিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত– এই সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্যপরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততই ঘোলা এবং ক্রমশঃ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল_ এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রত্যাবর্তন

পূর্বে যে-শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে-লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর শুরু হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম– সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল– স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেব-মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে- এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো-বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না- মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এইপ্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে-জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, ওখানে ইস্কুল নাই, মাস্টার নাই জোর করিয়া কেহ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না- ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়- ওখানে কারো কাছে সমস্ত দিনের সময়ের হিসাবনিকাশ করিতে হয় না, খেলাধূলা সমস্ত আপন ইচ্ছামত। বিশেষত দেখিতাম, ছোড়দিদি২ আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল যাইবার জন্য ভালোমানুষের মতো প্রস্তুত হইতাম- তিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতর দিকে চলিয়া যাইতেন দেখিয়া মনটা বিকল হইত। তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না

অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, “এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।”– তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু'ই মনে বড়ো বাড়িত। তার পরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে সাশির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্লভ সামগ্রী– তাহার কত রং এবং কত সজ্জা! আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না– কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিসগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙিন করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া তো দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি– খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে– সেই বারান্দা পার হইয়া গোটাচারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি– বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে– বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার– সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত– সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত– দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন

করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম তার পরে অর্ধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপ-সর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত, তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরে ঘরে কেবলই ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারবার বলিতে বলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই তাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতে লাগিল যে, মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার খাপ খাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। হায়, সকল জিনিসের মতোই গল্পও পুরাতন হয়, ম্লান হইয়া যায়, যে গল্প বলে তাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া পুরাতন গল্পের উজ্জ্বলতা যতই কমিয়া আসে ততই তাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নূতন রং লাগাইতে হয়।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধানবক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

নর্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো-একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষগুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল, যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়। আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণে কাব্যালংকার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।-

ওরে আমার মাছি!
আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্‌টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারা সম্বন্ধে অল্প যে-একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়ুবীড়িত সান্ধ্যসমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্জে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, "আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।" শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত–পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, "ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', "প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল-আঁখি', "রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', "কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', "ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে'- এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্‌ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে-মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া

আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে “ভুলিয়া গেছি’ বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জনা করিয়াছেন, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না।

মা মনে করিলেন, আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, “একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।” তখন মনে-মনে সমূহ বিপদ গনিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন, “রবি কেমন বাল্মীকীর রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্-না।” পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ-যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো-একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন– বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই “বেশ হইয়াছে’ বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে শুরু করিলাম। সেন্ট-জেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভৎর্সনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি২ কহিলেন,”আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।” আমি বেশ বুঝিতাম,ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারি দিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন

জেলখানা ও হাঁসপাতাল -জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা,তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

সেন্টজেবিয়ার্সের একটি পবিত্রস্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে–তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি। আমাদের সকল অধ্যাপক সমান ছিলেন না,বিশেষভাবে যে দুই-একজন আমার ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির গম্ভীর নম্রতা আমি উপলব্ধি করি নাই। বরঞ্চ সাধারণত শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হইয়া উঠিয়া বালকদিগকে হৃদয়ের দিকে পীড়িত করিয়া থাকেন,তাঁহারা তাহার চেয়ে বেশি উপর উঠিতে পারেন নাই। একে তো শিক্ষার কল একটা মস্ত কল,তাহার উপর মানুষের হৃদয়প্রকৃতিকে শুষ্ক করিয়া পিষিয়া ফেলিবার পক্ষে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের মতো এমন জাঁতা জগতে আর নাই। যাহারা ধর্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকায় প্রত্যহ পাক খাইতে থাকে,তবে উপাদেয় জিনিস তৈরি হয় না- আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেইপ্রকার দুইকলে-ছাঁটা নমুনা বোধ করি ছিল। কিন্তু তবু সেন্টজেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে,এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডি পেনেরান্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না- বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সে কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত,ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মনে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন- অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল- আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহাতাহা ভাবিতাম। একদিন

ফাদার ডি পেনেরান্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টাগোর, তোমার কী শরীর ভালো নাই।”– বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম–আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

সে-সময় আর-একজন প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন,তাঁহাকে ছাত্রেরা বিশেষ ভালোবাসিত। তাঁহার নাম ফাদার হেন্‌রি। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন,তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে আছে,সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক তাঁহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,”তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কী।” নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল– কোনোদিন নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া সে কিছুমাত্র উদ্‌বেগ অনুভব করে নাই– সুতরাং এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অভিধানে এত বড়ো বড়ো অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার মতো দুর্ঘটনা–নীরু তাই অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “নী ছিল রোদ, নীরদ–অর্থাৎ, যা উঠিলে রৌদ্র থাকে না তাহাই নীরদ।”

ঘরের পড়া

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না,তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে

লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।

রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর৪ মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে- ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল- তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই- অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম- যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার

যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরো বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, “এই বই আমি পড়িবই।”

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন– আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সেদিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো-এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না,তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল– ধরা পড়িয়া গেলাম। যাহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল; চাবি সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনই তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া

র্ভৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন- আমার ও সেই দশা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও নাই কেন। এক দিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, অন্য দিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্রৎেন্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত । তাহার জ্ঞানভান্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর-একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদত পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন সাগরের তীর! সে কোন

সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কে্□ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙিন রুমাল পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল।

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে সথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিললাম।

বাড়ির আবহাওয়া

ছেলেবেলার আমার একটা মস্ত সুযোগ এই যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বালিতেছে, লোক চলিতেছে দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না তবুও সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদুরের আলো। আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার, চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্বশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেকদিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহোর রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনো ধর্মসংগীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম
রচিতা যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
 ঝরে অবিরত ধারে--

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত “লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে’ গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন

মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারি দিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন–তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়াচুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশে এক-একজন এইরকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতে যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্বজনীন কর্মে সর্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক-একটি বড়ো বড়ো পরিবারে মধ্যে অখ্যাত ভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয়, এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে– এ যেন জ্যোতিষ্কলোক হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া তাহার দ্বারা দেশলাইকাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ইহার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত-অনুগত অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্যকৌতুত আমোদ-উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকারবশত তাঁহাদের সে-সমস্ত উদ্‌যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না– কিন্তু উৎসাহের ঢেউ চারি দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঔৎসুক্যের উপরে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। বেশ

মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী-একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (□□□□□□□□□) রচনা করিয়াছিলেন- প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে-

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে-
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে

এতবড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই-কিন্তু এক সময়ে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।

একটা নিতান্ত সামান্য ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষ ভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পরিতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ নাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বালিয়া একখানা ছন্দোমালা বই পায়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোন-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, “গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে”। তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি প্রাইজ পাও নাই?” আমি কহিলাম, “না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।” ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের প্রাইজ পাওয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল।

তিনি আমার সামনেই সে কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না-হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে- ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এ বাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন, কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল- কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না গুণদাদা কাছারিঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসিতেন- সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া গলায়া ক্ষূর দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য লাগিয়াছিল। এক দিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর এক দিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল। বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিস্ফলতা কেমন করিয়া থাকে । আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম।- এক-একদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য , তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন; এমন কি তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে এক একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতা সম্বন্ধে কী একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল “নিকটে” ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না অথচ কোনো মতেই তাহার সংগত মিল খঁউজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে “শকটে” শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না- কিন্তু মিলের দাবি কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায়

আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ পর্যন্ত তাহার আর-কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তখন দক্ষিণে বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্‌ক্ লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মতো কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবাডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার- বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম- তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলই মনে হয় তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড়

সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম- হাসিও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারি দিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি- সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে তবু সেই-সব বারান্দা, সেই-সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব আয়োজন ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল- এই জন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়োমানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহবান করিতে জানে না- খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। আমরা আজকাল যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমত তাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই- মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য, দেশহিতের জন্য, দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি- কিন্তু কিছুর জন্য নহে, সুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জামাইয়া বসা, মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করা, এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এতবড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য তখনকার দিনে যাঁহার প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকুল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ন থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনো প্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতে । আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সে দিকে খেয়ালও করিতেন না, রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔদার্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ভাঙায় তোলা মাছের মতো ছিলেন কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন, দাদাদের সভা হইতে যখন অনের রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না । এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

গীতচর্চা

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম-তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

তিনি আমাকে খুব-একটা বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিরতকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না- সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবলপক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি

অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্‌ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত, আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি- স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র-দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই- ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি- ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর-কিছুই নাই।

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমার সম্ভব, কিছু আর দুই-একটা জিনিস এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজবাবু। তিনি আমাকে প্রথমদিন গোল্ড্ স্মিথের ভিকর অফ ওয়েকফীল্ড্ হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনোকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই কেবল তপ্ত বাষ্প আছে– সেই বাষ্পভরা বুদবুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোন রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগবগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা-কিছু ছিল তাহা আমার নহে সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তি পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে– তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই, এই রকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপূণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারি দিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যের অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে-হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন- তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনই প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারি দিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল- তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার

নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন গুন আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি– আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না– যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠে সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে– “বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে’, “কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে’। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম। কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে, একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ-স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে– হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ-স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই “দেবতাত্মা’ হইতে আরম্ভ করিয়া “নগাধিরাজ’ পর্যন্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ করিয়াছেন।

বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্খাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি– কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে, “মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী’ আমি “গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম’। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন– তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই-একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারও মনে এ ধারণা বদ্ধমূল

হইয়া গিয়াছিল। যে আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ঠ দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মানলাভের পক্ষে আমার এই একটি মাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারো কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না– তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারো সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

রচনাপ্রকাশ

এ-পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোগত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোনোদিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম যে-গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ-সমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বই খানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন– তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে “ভুবনমোহিনী’ সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। “ভুবনমোহিনী’

কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং "ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা চলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন, "একজন বি। এ। তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন।" বি। এ। শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বি। এ।! শিশুকাল সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিসম্যানকে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে-দশা আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধুলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। "কুক্ষণে জনম তোর, রে সমালোচনা!' উদ্‌বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি। এ। সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যান্‌টির মতোই দেখা দিলেন না।

ভানুসিংহের কবিতা

পূর্বেই লিখিয়াছি,শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না– বোধ করি অক্ষয়বাবুর বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যার্টাটন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া

লিখিলাম “গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে’। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম- তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, “বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।”

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, “সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।” এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।”

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “নিতান্ত মন্দ হয় নাই।”

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা

কষিয়া দেখাইলে তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।

স্বাদেশিকতা

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূর ঠেকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত “মিলে সবে ভারতসন্তান’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি- লর্ড লিটনের সময় লিখিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দপনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। টাইম্‌স্‌ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের

ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দু-মেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতায় এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কি করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি-ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভ্য করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই

গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে– সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিমাণ অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে-বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং পূর্বস্মৃতির আলোচন করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় করিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়ে উঠিতেন– আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারের রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল– আমরা হত-আহত পশুপাক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী

রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়াবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোন একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরে বাঁধানো ঘাটে বসিয়া বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, “ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।” মালি তাহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।” ব্রজবাবু কহিলেন, “আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।” সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাহাঁর উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদে সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত, সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে– আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না– কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, “আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।” বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!– তখন ব্রজবাবু মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোকে ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ

ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটি মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না– না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন– গলার সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না–

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরাবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতী

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিয়াই, না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধ করি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই সেটা উলটাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইত। আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ আলোতে নির্জন ঘরে বই পড়িতাম; দূরে গির্জার পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিত- প্রহরগুলা যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে; চিৎপুর রোডে নিমতলাঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে ক্ষণে ক্ষণে “হরিবোল’ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি টবের বড়ো বড়ো গাছগুলির ছায়াপাতের দ্বারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে, একলা প্রেতের মতো বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেহ যদি মনে করেন, এ-সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে যখন তার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সদাসর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণবয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড। যে-সব উপকরণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয়, ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে।

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীয় সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস- কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য

ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই “কবিকাহিনী’ নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সে লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে-কবি যে লেখকের সত্তা নহে- লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে- যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে- তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাইরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময় যখন সংকোচ অনুভব করি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড়ো বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসভ্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে। বড়ো কথাকে খুব বড়ো গলায় বলিতে গিয়া নিঃসন্দেহই অনেক সময়ে তাহার শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়াছি। নিশ্চয়ই অনেক সময়ে বলিবার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠটাই সমুচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকটে একদিন ধরা পড়িবেই।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই

বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মৃত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দন্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে- বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ্ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

যে-বয়সে ভারতীতে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সে-বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক- বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্তু তাহার একটা অসুবিধা আছে; ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্পবয়সের উপর দিয়া কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে পড়িল, কে কী বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা- লেখার কোন্‌খানটাতে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে, ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা- এই-সমস্ত লেখাপ্রকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপা লেখাটাকে সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যতশীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। লিখিতে লিখিতে ক্রমশ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্‌ভাবিত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য দীর্ঘকাল বহুতর আবর্জনাকে জন্ম দেওয়া অনিবার্য। কাঁচা বয়সে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য এবং প্রতি পদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেইসঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা, কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

যাহাই হউক, ভারতীয় পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে- উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে-একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয় তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবার সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকরুন এবং ছেলেরা তখন ইংলণ্ডে– সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না– শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক-ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটি ও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে– কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। কিন্তু সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি

আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এ শাহিবাগ-প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম- এক-একদিন অন্ধকারে দুই-একটা বোলতা চাক হইতে আমার বিছানায় উপর আসিয়া পড়িত- যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্ণভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে “বলি ও আমার গোলাপবালা’ গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

ইংরাজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা-কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

বিলাত

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতশবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎশক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায়- কাঁচাবয়সে এ কথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভাব- সে যেন দুর্বলতা- এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত। ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ সতেরোবছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজোবউঠাকরুন তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন- তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, বরফ পড়িতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী সাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে-মূর্তি দেখিয়াছি এ সে-মূর্তিই নয়- এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর-কিছু- সমস্ত কাছের জিনিস যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে, শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর-কখনো দেখি নাই।

বউঠাকুরানীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকলরকম খেলায় আমর কোন বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না। □□□□শব্দে □-র উচ্চারণ □-র মতো এবং □□□□ শব্দে □-র উচ্চারণ □-র মতো- এটা যে কোনমতেই সহজজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে, সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কী করিয়া। মন্দভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরেজি উচ্চারণবিধির। এই দুটি ছোটো ছেলের মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্‌ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার্পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে- এখন সে-প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে-শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল- দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তো আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টর হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলের আমি ভরতি হইলাম। বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার।” (□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□!) এই ছোট কথাটি যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যাবসায় ছিল- তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি, এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে, আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টির্কতার নানাপ্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া

নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো-একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি, হয়তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম– ছাত্রের আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ, ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ-ইস্কুলেও আমার বেশিদিন পড়া চলিল না–সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয় ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে লণ্ডনে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে-বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই– বরফে-ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে– দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রং ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন; দশ দিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না। দৈবক্রমে কী কারণে একটা হারমোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকাল-সকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপনমনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া

যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা– গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়– শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য-অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলই তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত– ভালো কোনো-একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহ সঞ্চার করিতাম, আবার এক-একদিন তিনি বড় বিমর্ষ হইয়া আসিতেন– যেন যে-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখদুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত, অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম, ইহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না তবুও কোনমতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে-কয়দিন সে-বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই

কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন, “আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না।” আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই, তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিতমহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন। ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহারা ঘরে ইঁহার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিস কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে না- কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কার-জায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর- কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময়ে বউঠাকুরানী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে, তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না, এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতা-হাতে ছাতা-মাথায় নীল

সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম– কারণ, সেটা তো ছন্দও নহে, ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুকিয়া রহিয়াছে– সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলায় উপর দিনের আকাশ দোলা খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে– পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবু সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। আবার তাগিদ আসিলে– আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোটো দুইজন মেয়ে, ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহার ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি– মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে

পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকর-বাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজেই নিজের হাতে করিতে হয়- এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বেই আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতোজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে কথা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজন মাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজায় গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্তব্যের অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাপাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল, আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস্ স্কটের এটা যে খুব ভালো লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক-একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, “আমার মনে হয়, এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না।” কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষি কাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “না না, ও-টুপি চালাইতে পারিবে না।” তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্তের জন্য শয়তানের সংস্রব ঘটে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই-সমস্তের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনি পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুশি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, “এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে।”– লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই– এই ডাক্তার পরিবারে কেহ-বা পরলোক কেহ-বা ইহলোক কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।”– বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়তো আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি-জাতীয় কিছু পাইলাম না,

একটি অর্ধক্রাউন ছিল- সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নিবোর্ধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো-কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, "আপনি বোধ করি পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

যতদিন ইংলন্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই, তাহা বলিতে পারি না- কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুশি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি- তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাকে স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন, "এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও।" আমি নিতান্ত ভালোমানুষি করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। আমি মনে করিলাম, এইখানেই পালা শেষ হইল- কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন, ভারতবর্ষীয় সংগীতের একটা বুঝি আশ্চর্য নমুনা শুনিতে পাইবেন– তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধ যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত– আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম– স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম, এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর-কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, “□□□□□ □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□□□□□□□□□□!”তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড়ো দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লণ্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এ দিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে স্টেশনে গেলাম। সেদিন বড়ো দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই স্টেশনেই এ-লাইনের শেষ গম্যস্থান -তাই নিশ্চিত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রায়াজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম, স্টেশনগুলি সব ডান দিকে আসিতেছে। তাই ডান দিকের জানালা ঘেঁষিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকাল-সকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে– বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লন্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য স্টেশনের পূর্ব স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাটফর্ম্ নাই, কিছুই নাই । ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইতে বঞ্চিত– রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল– মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম যে স্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক স্টেশনে কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, সেইখান হইতেই তো এ গাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে। সে কহিল, লন্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে ? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তই সবচেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোর্টের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া স্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের □□□□ □□ □□□□□□□, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন,

এইজাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে– আধঘন্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে ঈতঢ়ত ষপ উঢ়বভদঢ়-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে-নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন,”এ কী রুবি, ব্যাপারখানা কী!” আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব-যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দন্ডভোগ করিতে হইবে না– বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, “এসো রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।”

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম । বৈঠকখানাঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, “এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক্।” আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘন্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি রহিল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ” রুবি, আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়।” এ-প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, “রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।” সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না- সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল- হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিষ হউক,নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি। তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে,খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠান্ডা কন্‌কন্‌ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গভারতীয় বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না- অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, “যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।” সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া

গৃহিণী কহিলেন,”ঐ ঘরে তিনি আছেন।” আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, “দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুন।”

লোকেন পালিত

বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি-সহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছরচারেকের ছোটো। যে বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চারবছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মতো নহে; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাহারো আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না- কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়াছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভর্ৎসনাকটাক্ষ আমাদের সরব হাস্যালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মান অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া সম্বন্ধে আমার চিত্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে বিদ্যালয়ের পড়ার বিঘ্নে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে-আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল,কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে– পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যাতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্‌সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে-সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে-আলোচনা শুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণযৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রামগতিতে যখন গদ্যপদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই। তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সংগীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে-সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পদ্মবনে বন্ধুত্বের পদ্মটির "পরেই দেবীর বিলাস বুঝিসকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর পরিচয় বড়ো বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের সুগন্ধি মধু সম্বন্ধ নালিশ করিবার কারণ আমার ঘটে না।

ভগ্নহৃদয়

বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারোবছর বয়সে কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশবছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্‌ধৃত করি- " ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হইয়া থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়- আমার আশপাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখর মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিলনা, কেবল নিজের মনটাই ছিল তাই আপনমনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে

জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদ্‌হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্‌গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে– কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষপরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না– তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না– এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের স্বাথী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায়– তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে– আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা । এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে-একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার কভ্ররত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন-সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না- সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এইজন্য ইংরেজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব-একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল,

শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িককালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না- মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্যই এই সাহিত্যের প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণপরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে আর-একদিন যখন পোপ-এর কালের ঢিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারি দিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে,তাহা উত্তেজনারই দিন।

অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না- কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এইজন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া

নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রদুর্ভাব সর্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে- সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনো ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে এইজন্যই সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজি-সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল,এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এস্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মতো ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্য-উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই, যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থুল হইলেও তাহাকে গ্রহন করিতে তাঁহার বাধা ছিল না।

তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক

করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিল্-এর যুগ ইতিহাসের একটি স্বভাবিক পর্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছুদিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিষ। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। এক দল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাখিশিকারে শিকারির যেমন আমোদ, গাছের উপরে বা তলায় একটা সজীব প্রাণী দেখিলেই তখন তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারির হাত যেমন নিশপিশ করিতে থাকে, তেমনি যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনই তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাস্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিদ্যা সামান্যই ছিল– তিনি যে সত্যানুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আর-একজন ব্যক্তির মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড়ো দুঃখ পাইতে হইত। এক-একদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।

আর-এক দল ছিলেন তাঁহারা ধর্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এই-জন্য ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন আছে,তাহাকে ভোগীর মতো আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না; তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিলনা– আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহূতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর-কোনো লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্ম সম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে–

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
  বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
  আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্তই অনাবশ্যক; দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী– এইজন্য কাব্যে সেই জিনিসটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল– ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্য আজও আমরা ধর্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি। সেইজন্যই বহুল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈষিতা দেশের যথার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

বিলাতি সংগীত

ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা তুলিতেছি– মাডাম নীল্‌সন অথবা মাডাম আল্‌বানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না– যে-সকল খাদসুর বা চড়াসুর সহজে তাঁহাদের গলায় আসে না, যেমন তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কোনো লজ্জা নাই। কারণ, আমাদের দেশে শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধশক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুশি হইয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহারা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিসটার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্রের মতো– তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য নগ্ন হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ-ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই– সেখানে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মানুষের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধঘন্টা ধরিয়া তানপুরার কান মলিতে ও তবলাটাকে ঠকাঠক্ শব্দে হাতুড়িপেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপে এইসকল উদ্‌যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখা হয়– সেখানে বাহিরে যাহা-কিছু প্রকাশিত হয় তাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজন্য সেখানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র দুর্বলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা। য়ুরোপে গলা সাধাটাই মূখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম– সেই গায়িকাটির গান-গাওয়া অদ্ভুত, আশ্চর্য। আমার মনে হল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা

কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল– বিশেষত "টেনর' গলা যাহাকে বলে সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়– তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন– ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকলরকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে– আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য– সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর– সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক; আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার

নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারংবার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকিপ্রতিভা

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ্ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লন্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই- তাহা আমার কল্পনার মধ্যে ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব,শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে । আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লন্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এইসকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের মজার রকমের হইয়াছে। এমন-কি, তাহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

এই দেশি ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি; কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিস্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।

সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে- এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা- অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে- ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র- স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সে সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল- ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রতষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল- বাল্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হার্বাট স্পেন্‌সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না- কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্‌সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া

গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ– ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে– ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা– কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হই নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া, দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধূ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল– ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার অনেককাল পরে “মায়ার খেলা’ বলিয়া আর-একটা গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মেলা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা স্রোতের ‘পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের

মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তবভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ কভ্ররত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজী-বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারম্বার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশী হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই-একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দুটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার “এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে; তখন

নবযৌবনের নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতুহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না, তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি– আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। তাঁহার কোনো ভয় ছিল না। যখন নিতান্তই বালক ছিলাম তখন তিনি আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া যাইব বলিয়া কিছুমাত্র উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নাই। সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যখন খবর আসিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন– হাতে আমার অস্ত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বাঘের চেয়ে আমারই বিপদের ভয় বেশি, বনের বাহিরে জুতা খুলিয়া একটা বাঁশগাছের আধ-কাটা কঞ্চির উপর চড়িয়া জ্যোতিদাদার পিছনে কোনোমতে বসিয়া রহিলাম– অসভ্য জন্তুটা গায়ে হাত তুলিলে তাহাকে যে দুই-এক ঘা জুতা কষাইয়া অপমান করিতে পারিব সে পথও ছিল না। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন– কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যাসংগীত

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি “হৃদয়-অরণ্য’ নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসংগীতে “পুনর্মিলন’-নামক কবিতায় আছে।–

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।–

হৃদয়-অরণ্য নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্খার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে– কেবল সন্ধ্যাসংগীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন– তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেইসময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিসটা বলে– ভয় কী তোমার, যাহা খুশী তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল– বাঁচিয়া গেলাম,যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেহ যেন গর্বোচ্ছাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব ছিল– কারণ গর্বই সে-সব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহংকার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ সে ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গর্ব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আর-একটা জিনিস। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না– আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার

করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে–তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তখন ছিলেন– অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন–

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়– তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না । লিখিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে

জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আবার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব- মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরো একজন আত্মীয় ছিলেন ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না -বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে-হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে; এইজন্যই সেটকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক, লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভুভার-বৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয় চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসূরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুশি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপধ্যোয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা

বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতিমহাশয় “বন্দে বাল্মিকী-কোকিলং’ বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রায়াগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজেরই ঐশ্বর্যেই বড়ো-বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম, “তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে’- তখনই দেখিলাম,সুর যে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া

আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সূদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে- তাহা যেন সমস্ত জলস্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, “তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!’ সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম,”আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী’– সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারিনা। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে- কোন রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি- তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই- হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিশ্ববিমোহিনী বাদশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম–

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল–

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়– মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন- আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিসাদে ও ব্যকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ- তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে- তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা উর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া সংকীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই- কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির “ভরা বাদর মাহ ভাদর’ পদটিকে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম- জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পুরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার

খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

আমরা যে-বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে– কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সাশিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড়-পল্লবেবেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা– সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে-সজ্জিত নরনারী কেহ-বা নামিতেছে। সার্শির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্‌ দূরদেশের,কোন্‌ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্‌ করিয়া মেলিয়া দিত– এবং কোথাকার কোন্‌ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারি দিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে– এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম–

অনন্ত এ আকাশের কোলে
  টলমল মেঘের মাঝার- -
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর

তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক-না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গন্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়। কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে যখন ঝাপসা বলিতেন তখন সেই সঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যোগ করিয়া দিতেন– ওটা যেন একটা ফ্যাশান। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভালো সে ব্যাক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে, ও বুঝি চশমাটাকে অলংকাররূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে, এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কম দেখার ভান করে, এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য– তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্য-সাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্য প্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়– ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকূতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই–যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে,

তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না- সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না- ইহার বর্ণনা নাই- এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে, তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যা-সংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো-মতে পৌঁছিতে পারিতেছিলনা। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে- অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা, কাব্যসৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে কাব্য লেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যে বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি- রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন,"এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য- রমেশ,তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন,"না"। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয়বাবু

এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল অলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চারকরিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন– তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভান্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস– এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

প্রভাতসংগীত

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে– সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটোছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম– মন বুক-ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব– কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে "বিধির প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে– প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই "বউঠাকুরানীর হাট' নামে এক বড়ো নভেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত

জগতের উপর হইতে এই-যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে– আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে– তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম– কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই “নির্ঝরের স্বপভঙ্গ’ কবিতাটির নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিংবা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, ” আচ্ছা মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।” আমাকে

স্বীকার করিতেই হইত, দেখি নাই- তখন সে বলিত, "আমি দেখিয়াছি।" যদি জিজ্ঞাসা করিতাম "কিরূপ দেখিয়াছ" সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজবিজ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত, তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাঁধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "এসো এসো।" সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক- আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়াবোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে, তখন আমার ভারি আনন্দ হইল- বোধ হইল, এই আমার মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল, এতদিনে এই সম্বন্ধে নিজেকে বারবার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতের বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না- বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই- এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে- সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম-

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি –

ইহা কবিপরিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন, তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এ আমার হইল ভালো- সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া, গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু

পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন-না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝর্ণার ধারে বসিলাম,তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম- কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক্, তাহাকে আর কেবল শূণ্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাত সংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ প্রতিধ্বনি নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থনির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায় রে, যেদিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিষ্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

কিছু-একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে “বুঝিলাম না’ তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে “কিছু বুঝিলাম না’ তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, “সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী।’ হয় ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয়, নয় খুব একটা ঘোরালো করিয়া বলিতে হয়, প্রকৃতির

ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষকে যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এইজন্যই তো ছন্দোবদ্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কোনোপ্রকারের কাজের জিনিষ নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার তো দাও কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়ানৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার তো সে তোমার বাহাদুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলেডিঙি নয়- খেয়ানৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেকদিনের লেখা- সেটা কাহারো চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারো কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালোমন্দ যেমনি হোক এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে-কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে-

ওগো প্রতিধ্বনি,
  বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
    বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে- প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া

প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি, কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর-একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তারর কোন্‌-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে- এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিমে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যাক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করি–

” “জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর’– ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়– যেমন নবোদ্‌গতদন্ত শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।

“ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনো-কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তাবই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাতসংগীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্‌মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর-কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।”

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়– বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়– তখন পূর্বরাগ ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত, অনুরাগ পূর্বরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সংকীর্ণ। তাহা একগ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাপিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে– বাহিরের সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্বাঙ্গীণ সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে “নিষ্ক্রমণ নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখদুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে-খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে- অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর-একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পেছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে- মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে অনাবৃত হইয়া গেল- সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল – চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর

পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া, আবার আরো একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে– পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবিলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে–প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য “বিবিধ প্রসঙ্গ” নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্যপরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভায় সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো–"হোমরাচোমরা'দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো মত মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা।

বলিতে গেলে যে-কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল– হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এপর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সাথে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট্ অফ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম– দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে-সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেনসিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক-একদিন সেইরূপ কোনো-একটা বই উপলক্ষ করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহাকিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলাসাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া

কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মত অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া, ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন- অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলনা। এমন-কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে “যমের কুকুর’ নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম ; তখনকার কালের আর-কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল-সভায় সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্‌মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী,আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম-বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্‌-একদিন সে মনে করিয়া বসিত- লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইঁহার মৃত্যুর

অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে- সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর-একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

কারোয়ার

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে– সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড় এবং এই নির্জন সংকীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার-প্রবেশ হইবে না। –

যাই যাই ডুবে যাই,   আরো আরো ডুবে যাই
    বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে কোন্ দূরে,   নিশীথের কোন্ মাঝে
    কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে   দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
    দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও।
অনন্ত দিবসনিশি   এমনি ডুবিতে থাকি,
    তোমরা সুদূরে চলে যাও।......
তোমরা চাহিয়া থাকো,   জ্যোৎস্না-অমৃত-পানে
    বিহ্বল বিলীন তারাগুলি;
অপার দিগন্ত ওগো,   থাকো এ মাথার 'পরে
    দুই দিকে দুই পাখা তুলি।
গান নাই,কথা নাই,   শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,

নাই ঘুম, নাই জাগরণ- -
কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায়;
নিশীথের মাঝে শুধু মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়!
গাও বিশ্ব, গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তবে নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে- -
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে- কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই- মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই কারোয়ারে "প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল– ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যে সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটি নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এর মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী– তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে|; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।

আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল- এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম-

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকিতির প্রতিশোধ -এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে,তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর স্থান কী তাহা জানি না- কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম-

হ্যাদে গো নন্দরানী- -
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে- সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না- সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়- সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে- দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য- পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট- কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড় জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ছবি ও গান

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্ক্যুলর রোডের একটি বাগান-বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্‌তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত– সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। কিন্তু কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের

বাইশবছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা-কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর-একরকম করিয়া শুরু হইল। একটা জিনিসের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে-সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিস আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটি পালা এই ছবি ও গান-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক-একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোটো শিশু যেমন ধুলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা-খুশি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে, কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দখেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এইজন্য সর্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা সুরে ভরিয়া ওঠে তখনই আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার-লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই– তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

বালক

“ছবি ও গান’ এবং “কড়ি ও কোমল’-এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র একবৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসংবরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিলনা– ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্‌-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!” বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।– জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে কী আমার গদ্যে পদ্যে, কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখনো যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া

নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম- এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূরপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।- কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙরছেঁড়া নৌকা- কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিলনা – তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ-পর্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বাচুলওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে-পাখি উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক- ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, সে বি. এ. পড়িতেছে কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্‌বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, “স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে।” বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “আপনি বোধ হয় এ-সমস্ত বিশ্বাস করেন না।” আমি বলিলাম, “আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক।” স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে

তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসংকোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে-ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এ-সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এ দিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের “আমি’ বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট না হইয়া ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।

বঙ্কিমবাবু

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উপযোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব– সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধৃ কবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি স্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারির প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথবাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথবাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে, তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র– যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরাজয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাহার চাপা ঠোঁটে, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারো সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার

চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়ে মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড়ো হইয়াছি; সে-সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি– কিন্তু সে-আসনটা কিরূপ ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না; ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়া ছিল; তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর-কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন– সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি; তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের

অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভালো বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশ ভূষা ব্যবহারেও সেই অর্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড়ো বড়ো এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের শৌখিনতা প্রকাশ পাইত; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময় অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন-আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য-ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিংবা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তর স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশিকিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত- ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়র সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার "প্রচার' পত্রে তিনি যে-ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্রআকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে- যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জাহাজের খোল

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাইকাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাইকাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে-খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে– ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমাহইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে– তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারো মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

এক দিকে বিলাতি কোম্পানি আর-এক দিকে তিনি একলা– এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা-বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ

করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল- বরিশাল-খুলনার স্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল, সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বৈ কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায়না- কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না- সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয়, এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার- সে তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যাবসা বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুশোক

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা' র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়– তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন– পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে- দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না– সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্যার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল,

শশ্মান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম- তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ- শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম- তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত- আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে- স্পর্শ আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই- তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়েসের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়- কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা

যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল- এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি- যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকেই মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায়না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে- তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা “নাই’-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই “আছে’-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না- একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না- এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য মতো পদার্থের মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে

একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতলায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি অক্টর্লনি মনুমেন্ট্‌টা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল- পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ

এক-এক বৎসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি, জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক-একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে চলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে; অপরাহ্ণে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না- পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বদ্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে যেন জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর নাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা

বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়– সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি-সেই শরতের সকালবেলায়।

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে–বাড়ির ঘন্টায় দুপুর বাজিয়া গেল–একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।–

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপনমনে।

মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে– সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপনমনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এ দিকে সেই কর্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ– সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই-করা শরৎ– আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পরে মহল, দ্বারের পরে দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া,কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

“কড়ি ও কোমল’ মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবারডড

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাস করিয়া কেম্‌ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিস্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে,পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো ব্যারিস্টরি ব্যবসায়ের বূহ্যের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম, সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে-সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেল্‌ফের মরক্কো-চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন্‌-একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-

এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙক্ষা এই কবিতাগুলির মুলকথা।

আশু বলিলেন, “তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।” তাঁহারই ‘পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’– এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে, তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন-যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল

জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাঁধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম, সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারি দিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারি দিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমস্বরে ডাকিতেছে– কিন্তু এ তো বাঁধাপুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে। মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা-ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল– আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত –“ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!’

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে- -
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে মাত্র- সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই।

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপরে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে, কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই- এ দিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে।

এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে-একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা-কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহলের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।